

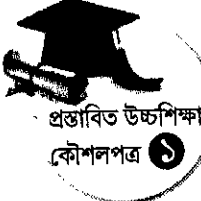
বড় সংস্কার আসছে উচ্চশিক্ষা খাতে

মুসতাক আহমদ

দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী ভর্তি, টিউশন ফি আদায়, শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভিসি নিয়োগসহ অন্তত ৮৩ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার নতুন কৌশলপত্রের (এসপিএইচই) খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এ সংস্কার কাজে আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে হবে হেকপ (উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প) থেকে। এটি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়ার ওপর অজ্ঞ রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, ‘আমাদের প্রধান টার্গেট সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে মানসম্মত ও দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করা। যেন আমাদের গ্রাজুয়েটরা বিশ্ব নাগরিক হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে। আমরা আর জ্ঞান আমদানি নয়, সৃষ্টি ও রফতানি করতে চাই। সেই ধরনের যোগ্য লোক তৈরি করতে চাই, যারা বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, উচ্চপাঠ্যের পেশাজীবী হবে। এটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। কিন্তু সেটা কিভাবে অর্জন করব, সেজন্য উচ্চশিক্ষার নতুন কৌশলপত্র তৈরি করা হচ্ছে।’

দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে এর আগে ২০০৬ সালে ২০



বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষার আরেকটি কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছিল। সেটির আলোকে ২০০৯ সালে হেকপ প্রকল্প নেয়া হয়। ১ হাজার ৯০৫ কোটি টাকার ওই প্রকল্পের দুই মেয়াদ আগামী বছরের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এটির বিভিন্ন সুপারিশ ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের কথা ছিল।

কিন্তু মেয়াদ শেষের ৯ বছর আগেই এটি পর্যালোচনা করে নতুনভাবে তৈরি করা হচ্ছে। যদিও ইউজিসি বলছে, এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) সামনে রেখে এই কৌশলপত্র আগাম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

এই কৌশলপত্র তৈরির পর ২০০৬ সালে

ছাত্রসমাজের একাংশ প্রতিবাদ জানায়। ইউজিসি ঘেরাওসহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়। যার দেয়াল লিখন এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়। তখন এর বিরুদ্ধে শিক্ষক আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল।

প্রস্তাবিত কৌশলপত্র বাস্তবায়ন হলে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ নির্ধারিত হবে অভিভাবকের আয় অনুযায়ী। সে অনুযায়ী বিত্তবানের সন্তানদের টিউশন ফিসহ লেখাপড়ার খরচ বাড়বে। যৌক্তিকীকরণ হবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা ব্যয়। একটি রেগুলেটরি কমিশন এ ব্যাপারে সুপারিশ তৈরি করবে। শিক্ষার্থীদের সহজ শর্তে ও নামমাত্র সুদের হারে ‘স্টুডেন্ট লোন’ দেয়া

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বড় সংস্কার আসছে উচ্চশিক্ষা খাতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হবে। বিদ্যমান নিয়োগ নীতিমালা সংশোধন করে লিখিত পরীক্ষা এবং ডামি ক্লাসে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি যোগ্যতার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে অতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের গবেষণা সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া যায়।

সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধন করা হবে। সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হবে অভিন্ন একটি আইনের অধীনে। এ ব্যাপারে কৌশলপত্রে বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিদ্যমান আইনের অভিন্নতা ও সংযোগের ঘাটতি আছে। এটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ঢাকাসহ পুরনো প্রধান চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশে পরিচালিত হচ্ছে। বাকি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির আলাদা আইন আছে। এগুলো অভিন্ন একটি আইনের অধীনে আনা দরকার। এর জন্য অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের অংশীজনদের প্রত্যাশা জানতে তাদের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। অধিক স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংস্থা পুনর্গঠন করা হবে। তাতে সিভিল সোসাইটি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সদস্য রাখার প্রস্তাব আছে।

২০০৬ সালের কৌশলপত্রেও সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন তৈরির কথা ছিল। সে অনুযায়ী ২০০৭ সালে খসড়া আইনও তৈরি করা হয়। তখন ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। ওই অবস্থায় আইন চূড়ান্ত করা থেকে পিছিয়ে যায় সরকার।

প্রস্তাবিত কৌশলপত্রে এছাড়া সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, সিনেট এবং অর্থ কমিটির গঠন পদ্ধতি পরিবর্তন করে অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সরকারি কলেজগুলো একক কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে। বর্তমানে একাডেমিক দিক দেখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, পদায়ন ইত্যাদি দেখে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। এর ফলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বাজেটের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। বাড়বে গবেষণার পরিধি ও বরাদ্দ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মেধাস্বত্ব অধিকার

নিশ্চিত করা হবে। এভাবে মোট ৮৩ ধরনের সংস্কার আসবে, যা তিন ধাপে ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। তবে এর মধ্যে ৩৪টি প্রথম ৫ বছর বা ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ‘ফাস্ট ট্রাক প্ল্যান অব অ্যাকশন’ (এফটিপিএ)।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, কৌশলপত্রে যেসব প্রস্তাবের কথা বলা হচ্ছে, তার কয়েকটি ভালো মনে হচ্ছে। তবে বাকিগুলোর কোনোটি অপ্রয়োজনীয়, কোনোটি অবাস্তব, বিভ্রান্তিকর এবং শিক্ষা সংকোচন নীতির শামিল। তিনি বলেন, ‘বিশ্বব্যাংকের যে কোনো কাজের ব্যাপারে আমি সন্দেহান থাকি। তারা জনগণের নয়, নিজেদের স্বার্থ দেখে। সমাজের মধ্যে একটি শ্রেণি তৈরি করে, যারা সুবিধা পাবে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের স্বার্থ দেখবে। শিক্ষাকে কোনো অবস্থাতেই কর্মসংস্থান থেকে আলাদা করা যাবে না। আর কর্মসংস্থানমুখী কোনো নীতি যদি করতেই হয়— সেটা করবে সরকার, বিশ্বব্যাংক নয়।’ তিনি ডেমনোস্ট্রেশন ক্লাস নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহ, অঙ্গীকার ও যোগ্যতা দেখা যেতে পারে। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার ধারণা উপযুক্ত নয়।

জানা গেছে, এই কৌশলপত্র তৈরিতে একটি মূল কমিটি ও ছয়টি সাবকমিটি কাজ করে। ১৯ সদস্যের মূল কমিটির নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, গবেষণা ও দাতা সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠনসহ অন্যান্য এতে সদস্য হিসেবে ছিলেন। কৌশলপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিতরণ ব্যবস্থা চার ধরনের। মোট শিক্ষার্থীর ১৭ দশমিক ১১ শতাংশ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ৫৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ পড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে। ১৭ দশমিক ২২ শতাংশ পড়ে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বাকি ৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ পড়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) অধীনে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩১ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। ১৯৭২ সালে ছিল ৩১ হাজার। উচ্চ মাধ্যমিক পাস বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কারণে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬ সাল নাগাদ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৬ লাখে পৌছাবে বলে এতে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।